ফুলি, বাঘ ও শিয়াল

হাসান আজিজুল হক

ঝা না ফুলি, খালপাড় থেকে একবার ঘুরে আয় না! গেঁড়ি-গুগলি ঝদি দুডো পাস ! দুফরডা তো গেল, রাতি কি করবি?

যার নাম নেত্যকালী, ফুলির মা, বলে। ভ্রূভঙ্গি করে বলে। এমন সুন্দর দেখায় তখন মাকে। কাজল-কালো চোখ দুটির একটি, বাঁ চোখটি সামান্য ছোট হয়ে যায়। একটি ভ্রূ সামান্য উপরে ওঠে আর চোখ দুটির নিজেদেরই আলো খানিকটা ঠিকরে পড়ে।

ফুলি ঘাড় হেলিয়ে বলে, যাস্‌সি। সত্যিই দুপুরবেলায় খাবার বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। একগাদা কলমি শাক সিদ্ধ আর খানিকটা মেটে আলু, সেও সিদ্ধ। কতো দিন আর এমন চলে। তবু চলছে তো দিনের পর দিন। মাছটাছ কিছু ধরতে পারলে, বেচতে পারলে দু'এক মুঠো মোটা চাল কিনে বাড়ি আসা যায়। সেইসব দিনে ভোজ। এখন মাছ আর প্রায় নেই। মাছ নেই, ব্যাঙ নেই, পোকা-মাকড় নেই, জোনাকি নেই সন্ধেবেলায়, ঝিঁঝি পোকা নেই এই তল্লাট এখন চেটেপুটে খাওয়া শেষ। কিন্তু ফুলিরা আছে ভালো। যতো কম খায়, ততো ভাল থাকে। জঙ্গলের বেতের মতো ছিপছিপে, গোলপাতার মতো চিকন। ফুলির এই বারো বছর বয়স, হাড়-মাংসের উপর চামড়া এমন ফিট হয়ে গেছে যে ফুলি আড়িমুড়ি ছাড়লে চামড়ায় যেন টান পড়ে—তবে নরম রাবারের মতো ঠিকঠাক বেড়ে যায়, তখন বেগুনি চামড়ার তলা দিয়ে টকটকে লাল রক্ত বইতে দেখা যায়। ফুলি, তার মা, তার বাবা অতো জানে না। শুধু জানে, না খেয়ে থাকাই ভালো। পৃথিবীর সবাইকে খেতে নেই। আর এই জল-জঙ্গলের দেশে ঘুরে বেড়াতে পারলেই ভালো খাবার জোটে। নদীর উপর খোলা বাতাস, চমৎকার খাওয়া যায়। এদিকে সূর্যের আলোতে ধুলো নেই, সে-ও ভালো খাওয়া যায়, মাটিসুদ্ধ শেকড় খাওয়া যায়, হরিণ যে ক্যাওড়া পাতা খায় কুড়িয়ে নিয়ে তাও খাওয়া চলে। তাছাড়া পেয়ে গেলে গুড়ি চিংড়ি বা এমনকি একটা বাগদাও কাঁচা খেয়ে নেওয়া যায়। পৃথিবীতে খিদে নিয়ে আবার কে থাকে। শুধু খারাপ অভ্যেসের জন্যে মানুষ খিদে খিদে করে হেদিয়ে মরে।

ফুলি যখন বেরিয়ে আসবে, তার মা বলে, জঙ্গলের দিকে অবেলায় যাস না, কদিন ধরি বড়োমিয়া ঘুরতিছে শুনেলাম। বোয়ালমারি খালের দিকে ঝা।

ফুলি চেয়ে দেখল, শীতের দুপুরে সূর্য পশ্চিমে কেবল হেলেছে। তবে রোদের কোনো তাত নেই উত্তরের বাতাস বইতে সু করেছে তো। তাত যেটুকু আছে, তার পান মেরে দিছে। দুপুরটা কেবল খক হয়ে উঠছে। নিবিড়, জমাট, গভীর। ফুলির মনে হয় সে দুপুরবেলায় ডুবতে থাকে। এই সময়টায় পাখি ওড়ে না, বাতাস বয় না, পাতা নড়ে না, সবুজ বন আকাশে উঠে গিয়ে আকাশের গায়ে সেঁটে যায়; ডুবতে ডুবতে সে ভাবে একফালি সবুজ হয়ে কখনো না কখনো সে-ও আকাশের গায়ে চিরকালের মতো সেঁটে লেগে থাকবে।

সারা পৃথিবীর যখন সমতলে পাতা নিজেদের ঘর-সংসার থেকে বেরিয়ে এসে সে নদীর উল্টোদিকে নিজেদের গাঁয়ের উত্তরে বোয়ালমারি খালের দিকেই যাচ্ছিল, কি মনে করে একবার পিছন দিকে চাইল। চোখ পড়ল তার নদীর বাঁধের দিকে, সাইকেল মোটর-সাইকেল, রিকশা, ভ্যানগাড়ি এমনকি মোটরগাড়িও যাচ্ছে। চেনা ছবি, দেখলেও যেন দেখতে পায় না, বাঁধের উপর দিয়ে দেখল হলুদ নদী জোয়ারে ফেঁপে উঠছে, ছাতা-পড়া সোনার মতো জলের রং আর অনেকদূরে, পশ্চিমদিকে নদীর উপরেই ধোঁয়াভরা গলা-পো কেবলই আকাশের দিকে উঠছে। এক পাহাড় গলা পো। আরও অনেক দুরে সূর্যের ঝিকিমিকি। ফুলি ফিরল। পায়ে পায়ে চলো বাঁধের উপরে বাজারের দিকে। কি যে ভয়ানক চিৎকার হিন্দী গানের, ক্যাসেটের দোকানে; তার পাশে কাপড়ের দোকান, তারপাশে ওষুধের দোকান, তারপরে মনোহারি দোকান, সিগারেটের দোকান, মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকান, ভাত খাবার হোটেল—এসব ফুলি জানে, এখানে এসে ইচ্ছে করলেই টিভি দেখা যায়। ফুলি সব চেনে, সব জানে, সমুদ্র চেনে, ন্যাংটো মেয়েমানুষ দেখেছে, মানুষ ন্যাংটো হলে কেমন জানোয়ারের মতো দেখতে হয়,তা-ও দেখেছে, আবার বন জঙ্গল অরণ্য পৃথিবীর সব ধরনের জীবজন্তু, বিরাট মভূমি, বিরাট জঙ্গল, বিরাট নদী, গাছ সাদা মানুষ কালো মানুষ, পেত্‌লা মানুষ—কোনো কিছুই ফুলিকে শেখাতে হবে না। তবে সে এখনও নিজেকে ঠিক জানে না। কি যে ঠিক করতে হবে বুঝতে পারে না। নিজের শরীরের বাইরেটা দেখতে পায়—কিন্তু শরীরের ভিতরে কি যে বিজবিজ বিড়বিড় করে, শিরশির টনটন করে ফুলি কিছুতেই ধরতে পারে না। তার বুক দুটি সুপারির মতো শক্ত আর তার চাইতে একটু বড়ো—হাত পড়লেই ব্যথা করে। সেখানে একটুও লোম নেই। অথচ নাভির নিচে, দুই উ যেখানে একসঙ্গে মিলেছে, সেখানে ত্রিভুজের মতো জায়গাটায় হালকা চিকন ধোঁয়াটে রোম দেখা দিয়েছে। ফুলি দেখেছে, জঙ্গলের ভিতরে হালকা বালির চর, তার উপর সরের মতো মাটি তার উপর নরম কচি দূর্বাঘাস। এই রকম। এসবের কেন কি কিছুই ফুলি বুঝতে পারবে। বিরক্তিতে মুখ তার কুঁচকে ওঠে। কি আশ্চর্য, এদিকে এই এত ভিড়, এত হৈচৈ—ঠিক ওপারেই জঙ্গল। ওপারেই বড়োমিয়া, ইয়া কেঁদো। সাঁতরে এপারেও আসে। বাঁধের উপর দিয়ে নদীকে হাতের ডানে রেখে ফুলি হাঁটতেই থাকে, দোকানগুলি আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যায়। চিৎকার-চেচাঁমেচি কমে আসে, সুন্দরী মেয়েদের দেহগুলি নদীর পাড়ে গাদাগাদি করে রাখা, জলে তাদের রক্ত চোয়াচ্ছে, একেবারে নির্জন, ডানা মেলে চিল বসে, তার সামনে পচা ইঁদুর তারপর খোলা জায়গায় হরগজ কঁটার জঙ্গল, তারপর নদীর পাড়ে কিছু নেই, ঢালু নিচে চুপচাপ জল, সেটা পেরিয়ে ফরেস্ট অফিস, কাঠের গুঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে নিচের ঘাটে অনেক ট্রলার, নৌকা, তার খানিকটা দুরে বাবার ভাঙ্গা কোষাটা বাঁধা। ফুলি ফরেস্ট অফিসের ভিতর দিয়ে হালকা পায়ে কাঠের গুঁড়িগুলো বেয়ে তরতরিয়ে নিচে নামল, জলে একটু পা ডুবিয়ে সোজা নিজেদের একরত্তি নৌকায় উঠে বৈঠা হাতে নিয়ে বাঁধন খুলে দিল।

মা যে বারণ করেছিল!

ট্রলারগুলো একটার পর একটা ঘাট ছেড়ে যাচ্ছে। খুব তাড়া প্রত্যেক নৌকায় একজন করে মাঝি আর একটা ছোঁড়া - দাঁত বের করে হাসছে। মাঝির আর দরকার কি—মোটরটা চালিয়ে দিলেই বিকট শব্দে নৌকা নিজেই চলতে শু করে। সব নৌকো কোনাকুনি নদী পেচ্ছে--বাইরের মানুষ সব ঘণ্টা দুয়েক সুন্দরবন দেখবে, নৌকা থেকে নামবে না কেউ, খানিকটা গিয়ে নদী ছেড়ে ছোটো বড়ো খাঁড়িতে ঢুকে পড়বে। ফুলি জানে নৌকার লোকগুলো বড়ো আমুদে, মেয়েরা থাকলে তাদের সাথে খুনসুটি করে, প্যান্ট আর গেঞ্জি গায়ে বড়ো বড়ো ধুমসি মেয়ে চকরা বকরা কাগজের প্যাকেট ছিঁড়ে--ফুলি জানে, চিপস বের করে খায়, পেটিস আর বিস্কুট খায়, চা খায়, কফি খায়--এসব কথা সব ফুলি শিখে নিয়েছে। ওরা ঢাকা থেকে বড়ো শহর থেকে সুন্দরবন দেখতে এসেছে। বেশিক্ষণ থাকবে না কেউ, খাঁড়ি ধরে এদিক-ওদিক ঘুরবে, খানিক বাদেই তাদের চেঁচানি বন্ধ হবে, জলের উপর যখন সুন্দরীর ছায়া পড়বে, হিম অন্ধকার চাদরের মতো পাতা হবে জলের উপর, পাতাহীন, হুমড়ি-খেয়ে পড়া ভাঙ্গা মাজা তুলতে না পারা ক্যাওড়ার ডালে বুড়ো শকুন কিংবা কদাকার মদনটাক বসে থাকতে দেখবে, ওদের কথা বন্ধ হবেই হবে, বেলা আর একটু পড়ে এলেই ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তারা খুনসুটি বন্ধ করে দেয়, হুল্লোড় বন্ধ করে দেয়। সামনের ট্রলারটা খুব দুলছে--জোয়ান জোয়ান ছেলেগুলো কেউ ছইয়ে উঠছে কেউ গলুইয়ে বসে আছে, কেউ কেউ ভিতরে গিয়ে খেজুর পাতার পাটিতে বসে আছে-- এই সময় ট্রলারের ইঞ্জিনটা গেল বন্ধ হয়ে--নৌকোর লোকটা রাগে রোষে চেঁচিয়ে উঠল শালার ইঞ্জিনের গুয়া মারি, হইছেডা কি, চোদানির ইঞ্জিন। আপনেরা বসেন, বসেন তো- কি হলো আবার ডিফেকটিভ ইঞ্জিন নিয়ে নৌকো ছাড়লে কেন? সময় কিন্তু চলে যাচ্ছে, ঘণ্টা ধরে ভাড়া নিয়েছি। আপনেরা বসেন তো বসেন, এহন নৌকার দিগ ঠিক থাকবে না নে। আর এই নদীটে খারাপ। দেখে মনে হয়, কিছু জানে না, ভারি খচ্চর শালী, বড়োমিয়ার মুখে তুলি দিয়ে আসতে পারে।

তার মানে?

দেখতিছেন না, ইঞ্জিন না চললি নৌকা কোনদিকি যাবে কেউ কতি পারে না।

ফুলি নিজের কোষাটাকে ট্রলারের গায়ে গায়ে লাগিয়ে বইতে থাকে। একেবারে সামনে ছই ধরে যে মানুষটা দাঁড়িয়েছিল, ফর্সা খুব সুন্দর দেখতে, খুব মজা ইয়ার্কি করছিল-- ফুলি তাকিয়েছিল তার মুখের দিকে একদৃষ্টে-- সে দেখছিল ভয়ে তার মুখটা সাদা হয়ে যাচ্ছে, সাঁতারও তো জানি না, বলছ কি তুমি। এই ফাঁপা পানিতে জাগায় জাগায় ফাঁকা কুঠরি আছে, জোয়ারের সোমায় কহনো কহনো নৌকা সেহানে চলে যায় কিংবা নদী পেরিয়ে কোনো খারাপ জাগায় আটকায়ে যাতিও পারে।

খারাপ জায়গা আবার কি?

উই যি, ভাটির দিকি দেখতিছেন বড়ো ক্যাওড়া গাছডার দিকে দ্যাহেন, লাল কাপড়ের পতাকা দুলতিছে দেখতি পাতিছেন, ঠিক ঐখানে কদিন আগে বড়ো মিয়া একডা মানুষ মারিছিল, তার চিহ্ ঐ লাল পতাকা। ইস শালার নৌকা দেখতিছে ঐ দিকিই যাতিছে।

ফুলি জানে লোকটা ভয় দেখাচ্ছে। আপনা-আপনি নৌকা কখনো ওখানে যাবে না। আর গেলেই বা হবে কি। বড়োমিয়া কি বসে আছে? বড়ো শিয়াল কোনোদিন কি সহজে দেখতে পাওয়া যায়? ফুলি আজ পর্যন্ত কোনোদিন তাকে দেখেনি। এদিকে, লোকটা ভয়ে যেন পাগল হয়ে উঠলো। ফুলি দেখছে, তার চোখ কপাল থেকে বেরিয়ে আসছে সারা মুখে তেলতেলে ঘাম, বাঁকাচোরা মুখ, ছপাৎ ছপাৎ থুথু বেরোচ্ছে মুখ থেকে, নৌকা ঘোরাও, ঘাটে নিয়ে যাও, যাবো না সুন্দরবন দেখতে। ভারি মজা পেয়ে হি হি করে হেসে উঠল ছোঁড়াটা, গেয়ে উঠল, মাগীর চুলে এট্টা ফুল মাগীর কানে দুডো দুল, মাগী হেসে হস্‌সে খুন, মাগীর সাথে ছোড়ো বুন- আমি বুনডারে নেব- গান থামিয়ে সে বলল। লোকটার আর জ্ঞানগাম্যি থাকে না, সব ভব্যতাটব্যতা ভুলে বোমার মতো ফেটে পড়ল, অ্যাই শুয়ারের বাচ্চা, হাসছিস কি জন্যে- পোদে তেল হয়েছে তোমার, দেব দুই লাথি, নৌকা ঘাটে লাগা।

ফুলি ঘুরন্ত ট্রলারের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। মাঝনদী পেরিয়েছে এখন। নদী যেন মাঝখানে সুতো দিয়ে লম্বালম্বি দু'ভাগ করা। সেই সুতো পেরলেই আর কোনো শব্দ নেই। জলের শব্দ নেই। অত জল নিঃশব্দে ঘুরছে, ফেনাচ্ছে আলোড়িত বিষের মতো পাক খাচ্ছে।

বনের সুবিশাল চুপ ঠিক নদীর মাঝ বরাবর এসে থমকে আছে। ওদিকের বাঁধ, লোকালয়, বাজার, মানুষ আর গাড়ি-ঘোড়ার কলরব সুতোর সীমানায় এসে নিঃশব্দের পেটের মধ্যে ঢুকে পড়েছে । ওপাড়ে সবুজ বন কালো, আকাশ আর নদীর পাড়ের মধ্যে চেপে বসানো, কঠিন ভারের মতো ভীষণ চুপের ভার, নদী আর বনের সংযোগরেখাটা বাঁকাচোরা, জায়গায় খসে যাওয়া, সেখানে বেত গোলপাতা কিছুই নেই, শুধু ঘাসের জমি বনের ভিতরে ঢুকে গেল-- সেখানে হরিণ থাকে,। লাল রঙের বাঁদর হেঁটে চলে বেড়ায়-- বায়ুভুক বল্লমের মতো শিকড়গুলোও দেখা যায় না।

ফুলি এইবার একা হয়ে গেছে। কখন থেকে সে একা হতে চাইছিল। ট্রলারগুলো এদিক-ওদিক খাঁড়িগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। তাদের ফেরার তাড়া আছে। আকাশের আলো যতক্ষণ। ফুলি একটা জুমে তো খাঁড়ি খুঁজছিল। খুব স, ভয়ে যেখানে কোনো ট্রলার ঢুকবে না। এসব খাঁড়ি বাবা দক্ষিণ রায় লাফিয়ে পারাপার করতে পারে। বারো বছরের ফুলি তো নদীর উপরের উজ্জ্বল রোদের দিকে চেয়ে ভীষণ ছায়াময়, খুব ঠান্ডা, দু'দিকে কাদা ভরা খাঁড়ি ধরে হেঁতাল আর বেতবনে খস খস আওয়াজ করতে করতে অনেকটা ভিতর ঢুকে পড়ল। ভুলে গেছে সে মা কি বলেছিল, এক আঁজলা গুগলি, দুটো কাঁকড়া নিতি পারলি বাবা-মা আর ছোড়ো ভাইডা প্রাণভরে সঞ্জেরাতে খেতে পারত ক্ষুদসেদ্ধর সঙ্গে। মায়ের ঘাড় হেলানো আর চোখের ভঙ্গি মনে পড়ে গেল ফুলির, ই ঘাট উ ঘাট করিসনি আর, ধিঙিপনা করিসনা, বাজারে সঞ্জেরাতে দোকানে গিয়ে টিভির সামনে হাঁ করে বসে থাকিসনি আর, কোনোদিন কেডা শালুক ঘুঁটে দেবানে কলাম, কাঠি ঢুকোতে

হবে ত্যাহন কয়ে রাখলাম। কি যে মা বলে কিচ্ছু বুঝিনে—ভেবে মুখ তুলতেই ফুলি নিজের সঙ্গে এমন মেশা মিশল যে ঘন পরম নিশ্বাস বইতে শু করল, নিজেকে ভালবেসে নিজেকে সপাটে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেছে সে, সেই পরিশ্রমই এত ঘন নিশ্বাস; এমন অনেকবার হয়েছে তার, মনে পড়ল, এই জঙ্গলে এসেই অনেকব ার আর মায়ের হেলানো ঘাড়, ভালবাসার চোখ মটকানি,সানকিভর্তি লাল ভাত, লাল লঙ্কা দেখে—তখন বুকের ভিতরটায় গরম লাগে আর অসহ্য লাগে আর অস্থির লাগে আর ভারি আনন্দ লাগে। কারণ, এখন খালের জল ছায়ায় কালো, আকাশ দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায় বাতাসে আলোতে ভরা, খাঁড়ির উপরে গ াছের পাতার এই ঘেরাটোপের মধ্যে আলো ঢোকবার কোন উপায় নেই, সবই নিবিড় ছায়া আর ঘন নিবিড় চুপ। নিঃশব্দই বাস্তব এখন। এই মহাপৃথিবীতে নিঃশব্দই মূল সংবাদ, সেটাই যে বাস্তবতা এখানে, এই সুন্দরবনে...তাই একটা পাতা গাছ থেকে খসে পড়ে বাজের শব্দে, কেন্নো চলে কিরকির করে, ন্যাড়া শিমূলের ডালে নিথর মাছরাঙা,জমাট, স্থির, একবার বিষাদখিন্ন কণ্ঠে ডেকে উঠলে অতল শূণ্যতা হাহাকার করে ওঠে আর মাটিতে মুখ লাগিয়ে ডোরাকাটা গর্জন করলে মাটি চৌচির হয়ে যায়। এই বিকেলে বনজুড়ে ঝিঁঝির ডাক, হরিণের তীব্র ডাক, বাঁদরের চিৎকার সবই ঢুকে পড়ে নিঃশব্দের পেটে। ফুলি আর একটু এগে াল। খালটা বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে, একেবারে হঠাৎ আরও স একটি খাঁড়ি কোনাকুনি এসে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সেখানে ঘাসের একটা ঢাল। খুব ঝরঝরে, পরিষ্ক ার, সেটুকু রোদে ভাসছে। নিচের দিকে জল সরে গিয়ে কাদা। ফুলি দেখতে পেল চার পাঁচটা বড়ো কাঁকড়া, কি করবে খুঁজে পাচ্ছে না, ফুলি ভাবছে, ফুলির জন্যই বা বুঝি অপেক্ষা করছে। সে কোষাটাকে বেঁধে ফেলল একটা মরা গাছের হাঁড়ি নিয়ে হাঁটুজলে, নেমে পড়ল ফুলি। তার স স আঙ্গুলগুলো কি দ্রুত, মূহূর্ত প ার হয়েছে কি হয়নি, কাঁকড়া ক'টি হাঁড়িতে ঢুকে খর্‌খর্‌ শব্দ করতে থাকে। খুব আনমনা হয়ে ফুলি গুগলি খোঁজে, শামুক খোঁজে, যদি পায় দু'একটি চিংড়ি। ফুলি মানচিত্রে একটা ফুটকি, খুব ছোটো কালো একটা ফুটকি। ঐটুকুতেই প্রাণ, কোমর সামান্য ভারি হয়েছে, কঠিন যন্ত্রণার সঙ্গে বুকের সুপারি দুটি বাড়ছে, কোমল ত্রিভুজের উপর রোঁয়ারা ঘন হচ্ছে, নিঃশব্দ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠছে। ফুলি সব পেল, গুগলি পেল দশটা, শামুক পেল দশটা, চিংড়ি পেল একটা, ফুলির খুব মোহ হলো, সে ঘাসের ঢালটা বেয়ে একটু উঁচুতে উঠে যেখানে বড়ো একটা সুন্দরী, তলাটা ঘাসে ভরা শুকনো, সেখানে গিয়ে হাঁড়িটা মাথার কাছে রেখে ল ালরোদের মধ্যে ওটিসুটি মেরে শুয়ে রইল।

এ তো মোহঘুম। বেশিক্ষণ রইল না। ফুলি একবার খালের দিকে পাশ ফিরল, একবার বনের দিকে, একবার শূণ্যদৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল খানিকক্ষণ, যতে াটা পারে দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল আর তার চোখ দুটি গরম পানিতে ভরে গেল। আবার খানিকক্ষণ মোহঘুম। নিজের সঙ্গে নিজের নিজিট জুড়ে-যাওয়া। আরও খা নিক পর ফুলি পটপট চোখজোড়া খুলে ফেলল। তখনো লেপটে রয়েছে। মোহ। তার মধ্যেই সে দেখল, হাত পনেরো দূরে হেঁতাল আর বেতবনের পাশে ঘাসের ভিতর শরীরের অর্ধেকটা ডুবিয়ে তারই মতো মোহঘুমে শুয়ে আছে ডোরাকাটা। বার দুই তিন চোখের পাতা খুলে আর বন্ধ করে, তারপর প্যাটপ্যাট করে চেয়ে ফুলি ডোরাকাটাকে ভালো করে দেখতে থাকল। না, কোনো ভুল নেই। ঐ যে কালচে সোনার মতো পাটকিলে রঙের উপর কালো কালো ডোরা, লেজ পড়ে অ াছে মাটিতে, থাবার চাটা লোমগুলো শেষ বিকেলের আলোয় চকচক করছে। আশ্চর্য, ফুলির ভয় হলো। চেঁচাল না সে, এবার চোখের পাতা একবারও না ফেলে একদৃষ্টে সে চেয়ে রইল থাবার উপর মাথা-রাখা ডোরাকাটার দিকে। চোখ বন্ধ ছিল ওর। এক যুগ পরে, ফুলির আকণ্ঠ তৃষ্ণা তখন প্রায় মিটে এসেছে, বুক ভরে উঠেছে, সারাজীবন আর তাকে না দেখলেও তার কিছুই সে ভুলবে না—এমন সময় মাথা তুলে সে ফুলিকে দেখতে পেল আর ফুলিরই মতো বারকতক চোখ পিটপিট করে তারপর নয়নভরে তাকে দেখতে থাকল। তার চোখেও এত তৃষ্ণা ছিল, কে জানত। একটা যুগ সে-ও কাটিয়ে দিল, তারপর আয়েস করে ইয়াও শব্দে মস্ত হাই তুলল। খোলা বাঁকা তলোয়ারের মতো নিচের উপরের চোঁয়ালের চারটে দাঁত, ঝোল-পড়া বিশাল লাল জিভ আর টাকরার খানিকটা ফুলি দেখতে পেল। ফুলি একটুও নড়েনি, দেখুক না যতোক্ষণ খুশি এমনি ভাব করে সে শুয়ে রইল আর দেখা হয়ে গেলে ডোরাকাটা উঠে দাঁড়াল, এক পা এগিয়ে এল, ফুলির দিকে। ভাঙ্গা একটা শুকনো ডাল হতে নিয়ে ফুলিও উঠল। ডোরাকাটা তখন সম্পূর্ণ ফিরেছে ফুলির দিকে, তার বেপরোয়া বুকের সাদা জায়গাটা দেখতে পেল ফুলি আর সে তার দিকে একবার এগিয়ে এলে, ফুলিও ডালটা সামান্য তুলে তার দিকে এক পা এগোল। ডোরাকাটা একটু ঘুরে গেল, যেন ফুলিকে পাশ থেকে দেখবে। ফুলিও ঘুরে ঘুরে তার সামানাসামনি হলো। এর মধ্যে একবারও সে ভোলেনি যে যেমন করেই হোক হাঁড়ির কাঁকড়া গুগলি শামুক আর চিংড়ি নিয়ে বা ড়িতে মায়ের কাছে তাকে ফিরতেই হবে। ডোরাকাটার যতো খিদেই থাক, ওগুলা ওকে দেয়া যাবে না। অনেকক্ষণ সামনে পিছনে ঘুরে, সিধে চোখে, আড় চোখে চেয়ে ডোরাকাটা হাঁক করে একটা শব্দ তুলে বিরাট এক লাফে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

ফুলির মোহ ছুটে গেল। আর একটুও দেরি নয়। এখুনি ফিরতে হবে। এখুনি ফিরতে হবে। মা খুঁজছে, বাবা খুঁজছে। কোষাটাকে খুলে দিয়ে সে দেখল স্রোতের ট ান বাড়ির দিকে। এখুনি বাড়ি যাবো, বাড়ি যাতি হবে। সূর্য আকাশে একটু আছে এখনো, করমচার মতো লাল। আর খানিকক্ষণ থাকুক। বাড়ি যাই, বাড়ি যাস্‌সি, বা ড়ি যাতি হবে।

পিছনে ট্রলার নৌকার আওয়াজ এলো। ঘাড় ঘুরিয়ে ফুলি দেখল অনেক দূরে একটা ট্রলার জল কাটতে কাটতে আসছে। সময় বেশি লাগল না, ফুলির কোষার ডানপাশ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে ট্রলার—মোটর বসানো ছোট একটা নৌকা, ফুলি দেখলো, তিনটি প্যান্ট-পরা গেঞ্জি-গায়ে ছোকরা যাচ্ছে নাচতে নাচতে। পেরিয়েও গেল, তারপর খালের ডানপাড়ে থামলো। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল কেউ। তারপর লাফ দিয়ে একজন খালের পাড়ে উঠলো, দু'জন লাফিয়ে পড়ল জলে, আর ওদের একজন ধরেছে কোষাটার মুখ, আর একজন ধরলো ফুলির হাত, এ যে সওয়ারি নিতে পারবে—আবার একজন বললো, আজ সারাদিন পেটে দানাপানি পড়েনি। অসময়ে গাছে ধরেছে পাকা শিম, আয় খোসা ছাড়িয়ে খাই। ফুলিকে জলে নামিয়ে টানতে টানতে এরপর একজন বলল চল—তোকে আমরা করব, মজা লাগবে দেখবি।

কোষাটা ভীষণ দুলছে। খালের পাড়ে কাদা আর ঘাসের মধ্যে ফুলিকে শুইয়ে দিয়েছে ওই তিনজন। ফুলি ভাববার চেষ্টা করল, কি করবে ওরা, কি করতে চাইছে, করমচার মতো লাল সূর্যের সামান্য একটা কোণ এখনও দেখা যাচ্ছে। কান-ফাটানো শব্দ করে ফুলির পাজামার দড়ি ছিড়ে গেল, একটানে সেটাকে লাফিয়ে তার দু'পা গলিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল ওদের একজন। ফুলি ভাবল, আর কাকে বলবে, কি করতে চায় ওরা, কাকে বলবে, মাকে বলি মা যাগো এই দ্যাখ, পাজামা খুলিছে আমার ওরা, এই দ্যাখ, ফোরকের মধ্যি হাত দিয়ে দিলে জামাডা ছিঁড়ি—মাগো, বুকে কামড় দিছে, একটা বুক ছিঁড়ি নেছে, ওমা, ওদের কি করিছি আমি। গলায় যে নখ ডুবায়ে দিইছে, বাবাগো আমার ওখানডায় খামছে ধরিছে। উঃ মা, ছুড়ি মারিছে আমারে, ছুড়ি মারিছে...।

জ্ঞান তখনও যায় নি ফুলির। মাটি তাকে খুব মায়া দিয়েছে আর সমস্ত সুন্দরবন জলভরা চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। তার বুকের উপরে উপুর হয়ে ছিল যে ছেলেটা, সে কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, সে কি উঠে বসে ফুলির দুই উ ঠিক করে দিতে টকটকে লাল ঘাড় অনেকটা উঁচু করে রেখেছিল, ফুলি তা দেখছিল। ত

ারপর ভীষণ ভয়ঙ্কর কড়াৎ শব্দে বাজ নেমে এল, এক শ' হাত লম্বা কালো ডোরাকাটা একটা বিদ্যুত চোখের উপর ঠিকরে পড়ল আর ফুলি দেখলো গলা ছেঁড়া একটা মুণ্ডু উড়ে গিয়ে খালের ওপারে পড়ল। ঝরঝর্ করে রক্ত পড়ছিল কি? মুণ্ডুটা কি চোখ চেয়েছিল? ডোরাকাটা হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল ফুলির পা ঘেঁসে, নিতান্ত অনুগতের মতো মাথা নামিয়ে মুণ্ডুছেঁড়া দেহটা মুখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, অন্য ছেলে দুটিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, ডোরাকাটা মুখে মড়ি নিয়ে সামনের প া বাড়িয়ে ফুলিকে পেবার আগে খড়খড় করে নখের মৃদু আঁচড় দিয়ে গেল। আর একবার মাথা তুলে ডুবে যাওয়া সূর্যের সাগরে দাউ দাউ জ্বলে যাওয়া আকাশের দিকে চাইল—তারপর মড়াটাকে একবারও না নামিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘন ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

ফুলি সারা রাত মোহঘুমে ঘুমিয়ে থাকে। সমস্ত সুন্দরবন জুড়ে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com